নিবন্ধ

ভগবদ্‌গীতার আলোকে সাম্যবাদ

গৌতমকুমার পাল

মুখবন্ধ

কোনও ব্যক্তি, দল বা মতবাদের অন্ধ উপাসনা বা কট্টর সমালোচনা— কোনওটিই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; এর সমস্ত বক্তব্য লেখকের ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ, গবেষণা ও উপলব্ধিজাত।

তথাকথিত জাগতিক সাম্যবাদ

আধুনিক সাম্যবাদের জনক জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) তাঁর তত্ত্বের অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরই পূর্বসুরি জর্জ হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)-এর অস্তিনাস্তি বিচার (dialectic)-এ, যার মূল কথা হল: বাস্তব বা সত্যের নিরন্তর অনুসন্ধান থেকে সৃষ্টি হয় একটি তত্ত্ব বা ধারণা (thesis), তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা থেকে সৃষ্টি হয় তার বিরোধী তত্ত্ব (antithesis), আর এই দুইয়ের সংঘাতের পরিণামে গড়ে ওঠে একটি নতুন সমন্বয়ী তত্ত্ব (synthesis), এবং এই আবর্তন চলতে থাকে চক্রাকারে। উক্ত বিচার থেকেই সঞ্জাত হয় মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক জড়বাদ (dialectic materialism), সমাজের দর্পণে যার প্রতিফলিত রূপ সাম্যবাদ (communism) নামে পরিচিত। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত *The Communist Manifesto*-তে মার্কস বলেছেন: "The history of all hitherto existing society is the history of class struggles." এই শ্রেণীসংগ্রাম আসলে কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায়ের (bourgeoisiec) সঙ্গে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের (proletariat) সংগ্রাম, যা হেগেলের thesis ও antithesis -এর সংগ্রামের অনুরূপ। মার্কসের প্রতিপাদ্য হল: এই সংগ্রামের অবসানে জন্ম নেবে একটি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা, যেখানে কোনও শ্রেণীভেদ থাকবে না। এই সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার কোনও ধারণা থাকবে না, মানুষ কাজ করবে রাষ্ট্রের (state) জন্য এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সম্পদের সমান বণ্টন, "from each according to his ability, to each according to his need" (১৮৭৫-এর "*Critique of the Gotha Program*"-এ মার্কসের বিখ্যাত স্লোগান।)

জাগতিক সাম্যবাদের দুর্বলতা

কোনও জাগতিক তত্ত্বই নিশ্ছিদ্র নয়, আর মার্কসের সাম্যবাদও তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষ রাষ্ট্রকে শ্রম দান করবে নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী, অথচ তার পারিশ্রমিক তার শ্রমের গুণ ও পরিমাণের সমানুপাতিক হবে না, হবে তার 'প্রয়োজন' অনুযায়ী— এই ধারণা দর্শন হিসেবে জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের বিচারে অধিকাংশ সাধারণ মানুষই এটা মেনে নিতে পারে না। কার প্রয়োজন কতটা— সেটা কে নির্ধারণ করবে? মানুষের প্রয়োজনের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, আর রাষ্ট্রের দ্বারা প্রয়োজনের মূল্যায়ন যে সঠিক হবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাই যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে, তাহলে তারা সাম্যবাদের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে অবলীলায় শোষণ ও শাসন করে যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্রেণীহীন সমাজ—কথাটা শুনতে বেশ ভালো লাগতে পারে, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে তার স্থাপন প্রায় অসম্ভব। প্রত্যেক মানুষের পরিবার, পরিবেশ, চিন্তা ও মনন, দক্ষতা, স্বভাব, মনোবৃত্তি, প্রতিভা বিভিন্ন। তাই আপাত-শ্রেণীহীন সমাজেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে থাকবে অলিখিতভাবে। 'প্রয়োজন'-এর সমানুপাতিক খাদ্যে হয়তো পেটের খিদে মিটবে, কিন্তু মানুষ যদি আলস্য ও কর্মক্ষমতার বিচারে দক্ষতার যোগ্য সম্মান না পায়, তাহলে মনের খিদে মিটবে কি? আর 'প্রয়োজন'-এর অবমূল্যায়নের সুযোগে পেটের খিদেও যে যথাযথ মেটে না, তার প্রমাণ ইতিহাস আমাদের বারবার দিয়েছে—

কখনও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পতনের মাধ্যমে, কখনও চিনের ধনতান্ত্রিকরণের মাধ্যমে।

আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ

তথাকথিত মার্কসবাদীরা যতই আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরবাদকে সাম্যবাদের চরম বিরোধী বলে মনে করুন না কেন, ভারতের সনাতন বৈদিক ধর্মে সাম্যবাদের জয়গান গাওয়া হয়েছে বারংবার। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, যা কিনা সমগ্র বেদ-পুরাণ-উপনিষদের সারাৎসার হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত, এবিষয়ে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করেছে পঞ্চম অধ্যায় 'কর্মসন্ন্যাসযোগ'-এর অষ্টাদশ শ্লোকে—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।"

অর্থাৎ, "জ্ঞানবান পণ্ডিতেরা বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।"

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে— এই সাম্যবাদের ভিত্তি কী? উত্তর—আত্মতত্ত্ব। ভগবদ্‌গীতা অনুসারে আমরা কেউই এই দৃশ্যমান জড়দেহ নই, আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি সচ্চিদানন্দ আত্মা—ঈশ্বর তথা পরমাত্মার অংশবিশেষ। আমাদের দেহ শুধু একটি সাময়িক আবরণ, মৃত্যুতে যার নবীকরণ ঘটে থাকে। এই তত্ত্ব হৃদয়ংগম করলে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে বিরোধের কোনও অর্থ থাকে না। কে হিন্দু? কে মুসলিম? কে ইহুদি? কে জার্মান? কে গোরা? কে কালো? কে মালিক? কে চাকর? সকলেই আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ। ভেদ কেবল এই অস্থায়ী নশ্বর জড়দেহের। এখন আমার জন্ম হয়েছে ভারতে। কিন্তু পরজন্মে আমি পাকিস্তানেও জন্মাতে পারি! মার্কসীয় সাম্যবাদে রাষ্ট্রের যা ভূমিকা, গীতার সাম্যবাদে সেই স্থান অধিকার করেন ঈশ্বর। আমার জমি, আমার বাড়ি, আমার দেশ— এই বোধ তখন লুপ্ত হয়ে যায়। যুদ্ধের, রক্তপাতের, হানাহানির কোনও অর্থই থাকে না। আমাদের সব কাজ তখন শুধুমাত্র কর্তব্যসম্পাদনের জন্য, ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত। এই সাম্যবাদ শুধুমাত্র মানুষকেই নয়, পশুপাখি এমনকী সমগ্র জীবজগৎকে এক প্রেমময় সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় 'ধ্যানযোগ'-এর বত্রিশ নম্বর শ্লোকে কৃষ্ণ বলেছেন:

"আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।"

অর্থাৎ, "হে অর্জুন! যিনি সমস্ত জীবের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের অনুরূপ সমানভাবে দর্শন করেন, আমার মতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।"

বর্ণভেদ—ধর্মের আফিং?

বাস্তবে দেখা যায়, সাম্য প্রতিষ্ঠার বদলে ধর্ম আরও অসাম্যের সৃষ্টি করেছে— বিভিন্ন দেশে ও কালে। পুঁজিবাদ যেমন এনেছে ধনী-দরিদ্র ভেদ, ধর্ম তেমনই এনেছে উঁচু জাতি-নিচু জাতি, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদ। তাছাড়া আন্তঃধার্মিক হানাহানি ও যুদ্ধ ধর্মের আরেকটি অবদান। কিন্তু যদি প্রতিটি ধর্মকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে— পৃথিবীর কোনও ধর্মই জাতিভেদের কথা বলে না। বর্ণভেদের জন্য সবচেয়ে কুখ্যাত সনাতন বৈদিক ধর্ম তো নয়ই। উচ্চ-নিম্ন ভেদ ধর্মের ফল নয়, ধর্মকে ভুল বোঝার ফল। গীতার চতুর্থ অধ্যায় 'জ্ঞানযোগ'-এর ত্রয়োদশ শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন:

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।।"

অর্থাৎ, "গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানবসমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।" এই চারটি বর্ণ হল: ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। লক্ষণীয়, কৃষ্ণ বলছেন যে এই বর্ণ নির্ণীত হয় গুণ ও কর্ম অনুসারে, জন্ম অনুসারে নয়। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মণ (পরম সত্য, আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাম্যবাদ-তত্ত্ব) জানেন যিনি। ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ ত্রাতা বা রক্ষক। বৈশ্য অর্থে ব্যবসায়ী আর শূদ্র অর্থে শ্রমিক বা শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে বোঝায়। পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বসমাজে এই চারটি শ্রেণীবিভাগ বর্তমান, পাশ্চাত্যে তা যথাক্রমে, intellectual class, administrative class, mercantile class এবং labour class নামে পরিচিত। ডাক্তারের পুত্র মানেই যেমন ডাক্তার হয় না, সেরকমই ব্রাহ্মণের পুত্র মানেই ব্রাহ্মণ হয় না, যদি না তার মধ্যে ব্রাহ্মণসুলভ গুণাবলি থেকে থাকে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় 'মোক্ষযোগ'-এর একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ শ্লোক পর্যন্ত এই চার বর্ণের প্রতিটির যোগ্যতা নির্দিষ্ট রয়েছে। তার মধ্যে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত গুণাবলির তালিকা এইরকম—শম (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম), দম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম), তপ (তপস্যা), শৌচ (বাহ্যিক ও আন্তরিক শুদ্ধতা), ক্ষান্তি (সহিষ্ণুতা), আর্জব (সরলতা), জ্ঞান, বিজ্ঞান (জ্ঞানের উপলব্ধি) ও আস্তিক্য (ধর্মপরায়ণতা)। এই গুণগুলি থাকলে একজন শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ হতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শাস্ত্র যদি এই কথা বলে, তাহলে বাস্তবে তার বিপরীত দেখা যায় কেন? আসলে ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন শাস্ত্র—আর মানুষ তা বিকৃত করে বানিয়েছে অস্ত্র। কিছু ব্রহ্মজ্ঞানহীন স্বার্থপর তথাকথিত ব্রাহ্মণ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে জাতিবৈষম্য ও ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার। কালক্রমে এই দুর্নীতি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সমাজের সর্বস্তরেই প্রসারিত হয়েছে। পারস্পরিক সহায়তার পরিবর্তে ঘনীভূত হয়েছে পারস্পরিক বিদ্বেষ। শুধু প্রাচ্যেই নয়, পাশ্চাত্যেও ঘটেছে এহেন উলট্‌পুরাণ। প্রাচীন ভারতবর্ষে যেমন ব্রাহ্মণরা নিজেদের অন্নসংস্থানের জন্য ক্ষত্রিয়দের ওপর নির্ভর করতেন, আর রাজনৈতিক পরামর্শের জন্য ক্ষত্রিয়রা নির্ভর করতেন ব্রাহ্মণদের ওপর (রামের রাজসভায় বশিষ্ঠ মুনি, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় চাণক্য প্রমুখ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ), পাশ্চাত্যেও গির্জার পাদ্রি ও রাজতন্ত্রের সম্পর্ক ছিল তেমনই। কিন্তু উভয়গোলার্ধেই কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের কার্যকলাপে ক্রমে ক্রমে পারস্পরিক বিশ্বাসের অবক্ষয় ঘটে। ফলস্বরূপ ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির আমলে কার্যকরী হয় "separation of church and state." পরবর্তীকালে রাজতন্ত্রের শাসন ও শোষণ জন্ম দেয় ফরাসি বিপ্লবের (ষোড়শ লুইয়ের আমলে, ১৭৮৯-১৭৯৯)—যার পরিণতিতে ইউরোপে ঘটে শিল্পবিপ্লব, অর্থাৎ বৈশ্যরা ক্ষমতা কেড়ে নেয় ক্ষত্রিয়দের হাত থেকে। কিন্তু আত্মতত্ত্ব না জানলে যা হয়, কালক্রমে বৈশ্যরা শূদ্রদের নিপীড়ন আরম্ভ করলে প্রতিবাদস্বরূপ সারা বিশ্বজুড়ে শুরু হয় শ্রমিক আন্দোলন (ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে)। আর এই প্রেক্ষাপটেই জন্ম নেয় মার্কসের সাম্যবাদ।

কিন্তু ঈশ্বরহীন সাম্যবাদ যে শোষণতন্ত্রের সামগ্রিক সমাধান নয়, তা ইতিহাসই বারবার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি সমাজ থাকলে শ্রেণী থাকবেই, আর নাস্তিক্যবাদ থাকলে শ্রেণীভেদ অবশ্যম্ভাবী। শ্রেণীহীন সমাজ একটি Utopia, কিন্তু গীতার দর্শন যদি সমাজের প্রেক্ষাপটে প্রোথিত করা যায়, তবে দেখব ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের শরীরে একই ঈশ্বরের অংশ একইরকম সচ্চিদানন্দ আত্মা বিরাজমান; এবং এই একই যুক্তি কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ বা হিন্দু-মুসলিম শরীর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আধ্যাত্মিক সাম্যবাদে রাষ্ট্রের ভূমিকা নেন ঈশ্বর এবং সেই ঈশ্বররূপ রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত থেকে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা ও সম্মানের মাধ্যমে লাভ করে পরম শান্তি :

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।"

অর্থাৎ, "আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড়জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" (গীতা, পঞ্চম অধ্যায় 'কর্মসন্ন্যাসযোগ', শ্লোক উনত্রিশ)।

ধর্মসম্পর্কে মার্কস ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত *A contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*-এ বলেন, "It is the opium of the people." সম্ভবত ধর্মের নামে অধার্মিক অত্যাচার দেখেই উনি একথা বলেছিলেন। কিন্তু হাত ব্যথা করলে হাত কেটে ফেলা যেমন তার সমাধান নয়, প্রয়োজন প্রকৃত চিকিৎসার, তেমনই ধর্মের নামে ভণ্ডামির সমাধান ধর্মহীনতা হতে পারে না—এর সমাধান জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার—যাতে তারা ধর্মের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যার তফাত বুঝতে শেখে। হিরোশিমা ও নাগাসাকির পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের জন্য যদি পদার্থবিদ্যার (physics) পড়াশুনো ও গবেষণা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হত, তাহলে সেটা যতটা অযৌক্তিক হত, ঠিক ততটাই যুক্তিহীন ধর্মের অপপ্রয়োগের জন্য ধর্মালোচনা নিষিদ্ধ করা। পৃথিবীর কোনও ধর্মই শাসন ও শোষণের কথা বলে না, শ্রেণী-বৈষম্যের কথা বলে না, পরধর্ম বিদ্বেষের কথাও বলে না।

উপসংহার

আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের কথা কেবল ভগবদ্‌গীতাতেই নয়, সনাতন বৈদিক দর্শনের অন্যান্য আকর-গ্রন্থে, এমনকী অন্য ধর্মের গ্রন্থাবলিতেও দেখা যায়। শ্রীঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি হল:

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম।।"

অর্থাৎ, "এই বিশ্বচরাচরে যা কিছু আছে তার মালিক পরমেশ্বর ভগবান এবং সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবনধারণের জন্য তিনি যেটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন, সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত এবং সবকিছুই যে ভগবানের সম্পত্তি তা ভালোভাবে জেনে, কখনওই অন্যের জিনিস গ্রহণ করা উচিত নয়।"

এমনকী নাস্তিক বলে বিদিত কার্ল মার্কস তাঁর স্লোগান "from each according to his ability, to each according to his need"-এর অনুপ্রেরণা *Bible* থেকে পেয়েছিলেন বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। *New Testament*-এর "Acts of Apostles"-এর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"All that believed were together, and had all things in common; And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had needed." (Acts 2:44-45)

"There was not a needy person among them, for as many as owned lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold. They laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had needed." (Acts 4:34-35).

মার্কস ছিলেন একজন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তাঁর তত্ত্ব হয়তো নিখুঁত নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্তও নয়। তাই মার্কসীয় সাম্যবাদের আমূল বর্জন নয়, বরং বৈদিক অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে তার সুসমঞ্জস সমন্বয় (synthesis)-ই দিশাহীন আধুনিক সমাজকে অগ্রগতির পথ দেখাতে পারে। আর সে সমন্বয় কেবল দর্শনে ও মননে নয়, জীবনে, কর্মে, পেশায় ও নেশায়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে কীভাবে করা সম্ভব, ভগবদ্‌গীতার পাতায়-পাতায় শ্লোকে-শ্লোকে রয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা।